হরিলক্ষ্মী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

এক টাকা আট আনা

মাঘ—১৩৬৩

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হরিলক্ষ্মী

১

যাহা লইয়া এই গল্পের উৎপত্তি, তাহা ছোট, তথাপি এই ছোট ব্যাপারটুকু অবলম্বন করিয়া হরিলক্ষ্মীর জীবনে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা ক্ষুদ্রও নহে, তুচ্ছও নহে। সংসারে এমনই হয়। বেলপুরের দুই সরিক, শান্ত নদীকূলে জাহাজের পাশে জেলে-ডিঙ্গীর মত একটি অপরটির পার্শ্বে নিরুপদ্রবেই বাঁধা ছিল, অকস্মাৎ কোথাকার একটা উড়ো ঝড়ে তরঙ্গ তুলিয়া জাহাজের দড়ি কাটিল, নোঙ্গর ছিঁড়িল এক মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র তরণী কি করিয়া যে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহার হিসাব পাওয়াই গেল না।

বেলপুর তালুকটুকু বড় ব্যাপার নয়। উঠিতে বসিতে

প্রজা ঠেঙ্গাইয়া হাজার-বারোর উপরে উঠে না, কিন্তু সাড়ে পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের কাছে তু'পাই অংশের বিপিনবিহারীকে যদি জাহাজের সঙ্গে জেলে-ডিঙ্গীর তুলনাই করিয়া থাকি ত বোধ করি, অতিশয়োক্তির অপরাধ করি নাই!

দূর হইলেও জ্ঞাতি এবং ছয়-সাত পুরুষ পূর্ব্বে ভদ্রাসন উভয়ের একত্রই ছিল, কিন্তু আজ একজনের ত্রিতল অট্টালিকা গ্রামের মাথায় চড়িয়াছে এবং অপরের জীর্ণ গৃহ দিনের পর দিন ভূমিশয্যা গ্রহণের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছে।

তবু এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল এবং এমনই করিয়াই ত বাকি দিনগুলা বিপিনের সুখ-দুঃখে নির্ব্বিবাদেই কাটিতে পারিত; কিন্তু যে মেঘখণ্ডটুকু উপলক্ষ করিয়া অকালে ঝঞ্ঝা উঠিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল, তাহা এইরূপ।

সাড়ে পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের হঠাৎ পত্নীবিয়োগ ঘটিলে বন্ধুরা কহিলেন, চল্লিশ একচল্লিশ কি আবার একটা বয়স! তুমি আবার বিবাহ কর। শত্রু-পক্ষীয়রা শুনিয়া হাসিল, চল্লিশ ত শিবচরণের চল্লিশ বছর

আগে পার হইয়া গেছে। অর্থাৎ কোনটাই সত্য নয়। আসল কথা, বড়বাবুর দিব্য গৌরবর্ণ নাদুস-নুদুস দেহ, সুপুষ্ট মুখের পরে রোমের চিহ্নমাত্র নাই। যথাকালে দাড়িগোঁফ না গজানোর সুবিধা হয় ত কিছু আছে, কিন্তু অসুবিধাও বিস্তর। বয়স আন্দাজ করা ব্যাপারে যাহারা নিচের দিকে যাইতে চাহে না, উপরের দিকে তাহারা যে অঙ্কের কোন্ কোঠায় গিয়া ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহা নিজেরাই ঠাহর করিতে পারে না। সে যাই হোক, অর্থশালী পুরুষের যে কোন দেশেই বয়সের অজুহাতে বিবাহ আটকায় না, বাঙ্গালা দেশে ত নয়-ই। মাস-দেড়েক শোক-তাপ ও না না করিয়া গেল, তাহার পরে হরি-লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া শিবচরণ বাড়ি আনিল। শূন্য গৃহ এক দিনেই ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ শত্রুপক্ষ যাহাই কেন না বলুক, প্রজাপতি যে সত্যই তাহার প্রতি এবার অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাহা মানিতেই হইবে। পাত্রের তুলনায় নববধূ বয়সের দিক দিয়া একেবারেই বে-মানান হয় নাই। বয়স একটু অধিক হউক, তবু সে যে সুন্দরী, এ কথা সকলেই স্বীকার করিল। সচরাচর বড় বয়সের চেয়েও লক্ষ্মীর বয়সটা কিছু বেশি হইয়া

গিয়াছিল, বোধ করি, উনিশের কম হইবে না। তাহার পিতা আধুনিক নব্যতন্ত্রের লোক, যত্ন করিয়া মেয়েকে বেশি বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য ইচ্ছা ছিল, শুধু ব্যবসা ফেল পড়িয়া আকস্মিক দারিদ্র্যের জন্যই এই সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী সহরের মেয়ে, স্বামীকে দুই-চারি দিনেই চিনিয়া ফেলিল। তাহার মুস্কিল হইল এই যে, আত্মীয় আশ্রিত বহু পরিজন পরিবৃত বৃহৎ সংসারের মধ্যে সে মন খুলিয়া কাহারও সহিত মিশিতে পারিল না। ওদিকে শিবচরণের যত্নের ত অন্ত রহিল না। রূপে গুণে হরিলক্ষ্মীকে সে যেন একেবারে অমূল্য নিধি লাভ করিল। বাটীর আত্মীয় আত্মীয়ার দল কোথায় কি করিয়া যে তাহার মন যোগাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। একটা কথা সে প্রায়ই শুনিতে পাইত—এইবার মেজবৌয়ের মুখে কালি পড়িল। কি রূপে, কি গুণে, কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে এত দিনে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল।

কিন্তু এত করিয়াও সুবিধা হইল না, মাস-দুয়েকের মধ্যে লক্ষ্মী অসুখে পড়িল। এই অসুখের মধ্যেই এক

দিন মেজবৌয়ের সাক্ষাৎ মিলিল। সে বিপিনের স্ত্রী, বড়-বাড়ির নূতন বধূর জ্বর শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিল। বয়সে বোধ হয় দুই-তিন বছরের বড়; সে যে সুন্দরী, তাহা মনে মনে লক্ষ্মী স্বীকার করিল: কিন্তু এই বয়সেই দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতের চিহ্ন তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে বছর-ছয়েকের একটি ছেলে, সে-ও রোগা। লক্ষ্মী শয্যার একধারে সযত্নে বসিতে স্থান দিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই, পরণে ঈষৎ মলিন একখানি রাঙা পাড়ের ধুতি, বোধ হয়, তাহার স্বামীর হইবে। পল্লীগ্রামের প্রথামত ছেলেটি দিগম্বর নয়, তাহারও কোমরে একখানি শিউলীফুলে ছোপানো ছোট্ট কাপড় জড়ানো।

লক্ষ্মী তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, ভাগ্যে জ্বর হয়েছিল, তাই ত আপনার দেখা পেলুম; কিন্তু সম্পর্কে আমি বড় জা হই মেজবৌ। শুনেছি, মেজঠাকুরপো এঁর চেয়ে ঢের ছোট।

মেজবৌ হাসিমুখে কহিল, সম্পর্কে ছোট হ'লে কি তাকে আপনি বলে?

লক্ষ্মী কহিল, প্রথম দিন এই যা বললুম, নইলে আপনি বলবার লোক আমি নই ; কিন্তু তাই ব'লে তুমিও যেন আমাকে দিদি বলে ডেকো না—ও আমি সইতে পারব না। আমার নাম লক্ষ্মী।

মেজবৌ কহিল, নামটি ব'লে দিতে হয় না দিদি, আপনাকে দেখলেই জানা যায়। আর আমার নাম—কি জানি, কে যে ঠাট্টা ক'রে কমলা রেখেছিলেন—এই বলিয়া সে সকৌতুকে একটুখানি হাসিল মাত্র।

হরিলক্ষ্মীর ইচ্ছা করিল, সে-ও প্রতিবাদ করিয়া বলে, তোমার পানে তাকালেও তোমার নামটি বুঝা যায়, কিন্তু অনুকৃতির মত শুনাইবার ভয়ে বলিতে পারিল না ; কহিল, আমাদের নামের মানে এক ; কিন্তু মেজবৌ, আমি তোমাকে তুমি বল্‌তে পার্‌লুম, তুমি পার্‌লে না।

মেজবৌ সহাস্যে জবাব দিল, হঠাৎ না-ই পার্‌লুম দিদি! এক বয়স ছাড়া আপনি সকল বিষয়েই আমার বড়। যাক্‌ না দুদিন—দরকার হ'লে বদলে নিতে কতক্ষণ ?

হরিলক্ষ্মীর মুখে সহসা ইহার প্রত্যুত্তর জোগাইল না, সে মনে মনে বুঝিল, এই মেয়েটি প্রথম দিনের

পরিচয়টিকে মাখামাখিতে পরিণত করিতে চাহে না ; কিন্তু কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই মেজবৌ উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, এখন তাহলে উঠি দিদি, কাল আবার—

লক্ষ্মী বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এখনই যাবে কি রকম, একটু ব'সো !

মেজবৌ কহিল, আপনি হুকুম করলে ত বসতেই হবে, কিন্তু আজ যাই দিদি, ওঁর আসবার সময় হ'ল। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছেলের হাত ধরিয়া যাইবার পূর্ব্বে সহাস্যবদনে কহিল, আসি দিদি ! কাল একটু সকাল সকাল আস্‌বো, কেমন ? বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিপিনের স্ত্রী চলিয়া গেলে হরিলক্ষ্মী সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। এখন জ্বর ছিল না, কিন্তু গ্লানি ছিল। তথাপি কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত সে ভুলিয়া গেল। এত দিন গ্রাম ঝেঁটাইয়া কত বৌ-ঝি যে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু পাশের বাড়ির দরিদ্র ঘরের এই বধূর সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। তাহারা যাচিয়া আসিয়াছে, উঠিতে চাহে নাই। আর বসিতে বলিলে ত কথাই নাই। সে কত প্রগলভতা, কত

বাচালতা, মনোরঞ্জন করিবার কত কি লজ্জাকর প্রয়াস। ভারাক্রান্ত মন তাহার মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহাদেরই মধ্য হইতে অকস্মাৎ কে আসিয়া তাহার রোগশয্যায় মুহূর্ত্ত-কয়েকের তরে নিজের পরিচয় দিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়াও লক্ষ্মী কি জানি কেমন করিয়া অনুভব করিল—তাহার মত সে কিছুতেই কলিকাতার মেয়ে নয়। পল্লী অঞ্চলে লেখাপড়া জানে বলিয়া বিপিনের স্ত্রীর একটা খ্যাতি আছে। লক্ষ্মী ভাবিল, খুব সম্ভব বৌটি সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারে, কিন্তু তাহার বেশি নহে। যে পিতা বিপিনের মত দীন দুঃখীর হাতে মেয়ে দিয়াছে, সে কিছু আর মাষ্টার রাখিয়া স্কুলে পড়াইয়া পাশ করাইয়া কন্যা সম্প্রদান করে নাই। উজ্জ্বল শ্যাম—ফর্সা বলা চলে না; কিন্তু রূপের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, শিক্ষা, সংসর্গ, অবস্থা, কিছুতেই ত বিপিনের স্ত্রী তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না; কিন্তু একটা ব্যাপারে লক্ষ্মীর নিজেকে যেন ছোট মনে হইল। তাহার কণ্ঠস্বর—সে যেন গানের মত, আর বলিবার ধরণটি একেবারে মধু দিয়া ভরা। এতটুকু জড়িমা

নাই, কথাগুলি যেন সে বাড়ি হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিল এমনই সহজ; কিন্তু সব চেয়ে যে বস্তু তাহাকে বেশি বিদ্ধ করিল, সে ওই মেয়েটির দূরত্ব। সে যে দরিদ্র ঘরের বধূ, তাহা মুখে না বলিয়াও এমন করিয়াই প্রকাশ করিল, যেন ইহাই তাহার স্বাভাবিক, যেন এ ছাড়া আর কিছু তাহাকে কোনমতেই মানাইত না। দরিদ্র, কিন্তু কাঙাল নয়। এক পরিবারের বধূ, একজনের পীড়ায় আর একজন তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—ইহার অতিরিক্ত লেশমাত্রও অন্য উদ্দেশ্য নাই। সন্ধ্যার পরে স্বামী দেখিতে আসিলে হরিলক্ষ্মী নানা কথার পরে কহিল, আজ ও-বাড়ির মেজবৌ-ঠাকরুণকে দেখলাম।

শিবচরণ কহিল, কাকে? বিপিনের বৌকে?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এত কাল পরে আমাকে নিজেই দেখতে এসেছিলেন; কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের বেশি বসতে পারলেন না, কাজ আছে ব'লে উঠে গেলেন।

শিবচরণ কহিল, কাজ? আরে, ওদের দাসী আছে না চাকর আছে? বাসন-মাজা থেকে হাঁড়ি-ঠেলা পর্য্যন্ত—কই তোমার মত শুয়ে ব'সে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটাক্ ত দেখি?

এক ঘটি জল পর্য্যন্ত আর তোমাকে গড়িয়ে খেতে হয় না।

নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য হরিলক্ষ্মীর অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু কথাগুলা নাকি তাহাকে বাড়াইবার জন্যই, লাঞ্ছনার জন্য নহে, এই মনে করিয়া সে রাগ করিল না, বলিল, শুনেছি নাকি মেজবৌয়ের বড় গুমোর, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না?

শিবচরণ কহিল, যাবে কোত্থেকে? হাতে কগাছি চুড়ি ছাড়া আর ছাইও নেই—লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না।

হরিলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া বলিল, লজ্জা কিসের? দেশের লোক কি ওঁর গায়ে জড়োয়া গয়না দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, না, দেখতে না পেলে ছি ছি করে?

শিবচরণ কহিল, জড়োয়া গয়না আমি যা তোমাকে দিয়েছি, কোন্ বেটা তা চোখে দেখেছে? পরিবারকে আজ পর্য্যন্ত দুগাছা চুড়ি ছাড়া আর গড়িয়ে দিতে পারলি নে! বাবা! টাকার জোর বড় জোর! জুতো মারবো আর—

হরিলক্ষ্মী ক্ষুণ্ণ ও অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, ছি ছি, ও সব তুমি কি বল্‌ছ ?

শিবচরণ কহিল, না না, আমার কাছে লুকোছাপা নেই—যা বল্‌ব, তা স্পষ্টাস্পষ্টি কথা।

হরিলক্ষ্মী নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া শুইল। বলিবারই বা আছে কি? ইহারা দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রূঢ় কথা কঠোর ও কর্কশ করিয়া উচ্চারণ করাকেই একমাত্র স্পষ্টবাদিতা বলিয়া জানে। শিবচরণ শান্ত হইল না, বলিতে লাগিল, বিয়েতে যে পাঁচশ টাকা ধার নিয়ে গেলি, সুদে-আসলে সাত-আট শ হয়েছে, তা খেয়াল আছে? গরীব একধারে প'ড়ে আছিস্ থাক্, ইচ্ছে কর্‌লে যে কান ম'লে দূর ক'রে দিতে পারি। দাসীর যোগ্য নয়—আমার পরিবারের কাছে গুমোর!

হরিলক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল। অসুখের উপরে বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার সর্ব্ব শরীর যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।

পরদিন দুপুর-বেলায় ঘরের মধ্যে মৃদু শব্দে চোখ চাহিয়া দেখিল, বিপিনের স্ত্রী বাহির হইয়া যাইতেছে। ডাকিয়া কহিল, মেজবৌ, চলে যাচ্চো যে?

মেজবৌ সলজ্জে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি ভেবে-ছিলাম, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ কেমন আছেন, দিদি?

হরিলক্ষ্মী কহিল, আজ ঢের ভাল আছি। কই, তোমার ছেলেকে আনো নি?

মেজবৌ বলিল, আজ সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো দিদি।

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো মানে কি?

অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে ব'লে আমি দিনের-বেলায় বড় তাকে ঘুমোতে দিই নে, দিদি।

হরিলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, রোদে রোদে দুরন্তপনা ক'রে বেড়ায় না?

মেজবৌ কহিল, করে বই কি; কিন্তু ঘুমোনোর চেয়ে সে বরঞ্চ ভাল।

তুমি নিজে বুঝি কখনো ঘুমোও না?

মেজবৌ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিলক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, মেয়েদের স্বভাবের মত এবার হয় ত সে তাহার অনবকাশের দীর্ঘ তালিকা দিতে বসিবে, কিন্তু সে সেরূপ কিছুই করিল না। ইহার পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় হরিলক্ষ্মী

তাহার বাপের বাড়ির কথা, ভাই-বোনের কথা, মাষ্টারমশায়ের কথা, স্কুলের কথা, এমন কি তাহার ম্যাট্রিক পাশ করার কথাও গল্প করিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে যখন হুঁস হইল, তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, শ্রোতা হিসাবে মেজবৌ যত ভালই হোক, বক্তা হিসাবে একেবারে অকিঞ্চিৎকর। নিজের কথা সে প্রায়ই কিছুই বলে নাই। প্রথমটা লক্ষ্মী লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু তখনই মনে করিল, আমার কাছে গল্প করিবার মত তাহার আছেই বা কি! কিন্তু কাল যেমন এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাহার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তেমনই ভারি একটা তৃপ্তি বোধ করিল।

দেয়ালের মূল্যবান ঘড়িতে নানাবিধ বাজনা-বাদ্য করিয়া তিনটা বাজিল। মেজবৌ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে কহিল, দিদি, আজ তা হ'লে আসি?

লক্ষ্মী সকৌতুকে বলিল, তোমার বুঝি ভাই তিনটে পর্য্যন্তই ছুটি? ঠাকুরপো নাকি কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ি ঢোকেন?

মেজবৌ কহিল, আজ তিনি বাড়িতে আছেন।

আজ কেন তবে আর একটু ব'সো না?

মেজবৌ বসিল না, কিন্তু যাবার জন্যও পা বাড়াইল না। আস্তে আস্তে বলিল, দিদি, আপনার কত শিক্ষা-দীক্ষা, কত লেখা-পড়া, আমি পাড়াগাঁয়ের—

তোমার বাপের বাড়ি বুঝি পাড়াগাঁয়ে?

হাঁ দিদি, সে একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে। না বুঝে কাল হয় ত কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, কিন্তু অসম্মান করার জন্যে—আমাকে আপনি যে দিব্যি করতে বলবেন দিদি—

হরিলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি মেজবৌ, তুমি ত আমাকে এমন কোন কথাই বল নি!

মেজবৌ ও কথার প্রত্যুত্তরে আর একটি কথাও কহিল না; কিন্তু 'আসি' বলিয়া পুনশ্চ বিদায় লইয়া যখন সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, তখন কণ্ঠস্বর যেন তাহার অকস্মাৎ আর একরকম শুনাইল।

রাত্রিতে শিবচরণ যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন হরিলক্ষ্মী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মেজবৌয়ের শেষের কথাগুলা আর তাহার স্মরণ ছিল না। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মনও শান্ত, প্রসন্ন ছিল।

শিবচরণ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ বড়বৌ?

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিয়া কহিল, ভাল আছি।

শিবচরণ কহিল, সকালের ব্যাপার জান ত? বাছাধনকে ডাকিয়ে এনে সকলের সাম্‌নে এম্‌নি কড়কে দিয়েছি যে, জন্মে ভুলবে না। আমি বেলপুরের শিবচরণ। হাঁ!

হরিলক্ষ্মী ভীত হইয়া কহিল, কাকে গো?

শিবচরণ কহিল, বিপনেকে। ডেকে ব'লে দিলাম, তোমার পরিবার আমার পরিবারের কাছে জাঁক ক'রে তাকে অপমান ক'রে যায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা! পাজি, নচ্ছার, ছোটলোকের মেয়ে! তার ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে গাঁয়ের বার ক'রে দিতে পারি জানিস্‌।

হরিলক্ষ্মীর রোগক্লিষ্ট মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল—বল কি গো?

শিবচরণ নিজের বুকে তাল ঠুকিয়া সদর্পে বলিতে লাগিল, এ গাঁয়ে জজ বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, আর দারোগা পুলিস বল, সব এই শর্ম্মা! এই শর্ম্মা! মরণ-কাঠি, জীবন-কাঠি এই হাতে। আমি লাটু চৌধুরীর ছেলে—তুমি বল, কাল যদি না বিপনের বৌ এসে তোমার পা টেপে ত আমি—

বিপিনের বধূকে সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার বিবরণ ও ব্যাখ্যায় লাটু চৌধুরীর ছেলে অ-কথা কু-কথার আর শেষ রাখিল না। আর তাহারই সম্মুখে নির্নিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া হরিলক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, ধরিত্রী, দ্বিধা হও!

দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যার দেহরক্ষার জন্য শিবচরণ কেবলমাত্র নিজের দেহ ভিন্ন আর সমস্তই দিতে পারিত। হরিলক্ষ্মীর সেই দেহ বেলপুরে সারিতে চাহিল না। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদলাইবার। শিবচরণ সাড়ে পোনর আনার মর্য্যাদা মত ঘটা করিয়া হাওয়া বদলানোর আয়োজন করিল। যাত্রার শুভ দিনে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, আসিল না কেবল বিপিন ও তাহার স্ত্রী। বাহিরে শিবচরণ যাহা না বলিবার, তাহা বলিতে লাগিল এবং ভিতরে বড় পিসি উদ্দাম হইয়া উঠিলেন। বাহিরেও ধূয়া ধরিবার লোকাভাব ঘটিল না, অন্তঃপুরেও তেমনই পিসিমার চিৎকারের আয়তন বাড়াইতে যথেষ্ট স্ত্রীলোক জুটিল। কিছুই বলিল না শুধু হরিলক্ষ্মী। মেজবৌয়ের প্রতি তাহার ক্ষোভ ও অভিমানের মাত্রা কাহারও অপেক্ষাই কম ছিল না। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, তাহার বর্ব্বর স্বামী যত অন্যায়ই করিয়া থাক, সে নিজে ত কিছু করে নাই, কিন্তু ঘরের ও বাহিরের যে সব মেয়েরা আজ চেঁচাইতেছিল, তাহাদের সহিত

কোন সূত্রেই কণ্ঠ মিলাইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। যাইবার পথে পাল্কীর দরজা ফাঁক করিয়া লক্ষ্মী উৎসুক চক্ষুতে বিপিনের জীর্ণ গৃহের জানালার প্রতি চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারও ছায়াটুকুও তাহার চোখে পড়িল না।

কাশীতে বাড়ি ঠিক করা হইয়াছিল, তথাকার জল-বাতাসের গুণে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইল না। মাস চারেক পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার দেহের কান্তি দেখিয়া মেয়েদের গোপন ঈর্ষার আর অবধি রহিল না।

হিম-ঋতু আগতপ্রায়। দুপুর-বেলায় মেজবৌ চিররুগ্ন স্বামীর জন্য একটা গরমের গলাবন্ধ বুনিতেছিল, অনতি-দূরে বসিয়া ছেলে খেলা করিতেছিল, সে-ই দেখিতে পাইয়া কলরব করিয়া উঠিল, মা, জ্যাঠাইমা।

মা হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া লইয়া আসন পাতিয়া দিল, স্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, শরীর নিরাময় হয়েছে, দিদি?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ হয়েছে; কিন্তু না হতেও পারতো, না ফিরতেও পারতাম, অথচ যাবার সময়ে একটিবার খোঁজও নিলে না। সমস্ত পথটা তোমার জানালার পানে

চেয়ে চেয়ে গেলাম, একবার ছায়াটুকুও চোখে পড়ল না। রোগা বোন চ'লে যাচ্ছে, একটুখানি মায়াও কি হ'ল না, মেজবৌ? এম্‌নি পাষাণ তুমি?

মেজবৌয়ের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে কোন উত্তরই দিল না।

লক্ষ্মী বলিল, আমার আর যা দোষই থাক মেজবৌ, তোমার মত কঠিন প্রাণ আমার নয়। ভগবান না করুন, কিন্তু অমন সময়ে আমি তোমাকে না দেখে থাকৃতে পারতাম না।

মেজবৌ এ অভিযোগেরও কোন জবাব দিল না, নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী আর কখনও আসে নাই, আজ এই প্রথম এ বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। শতবর্ষের জরাজীর্ণ গৃহ, মাত্র তিনখানি কক্ষ কোনমতে বাসোপযোগী রহিয়াছে। দরিদ্রের আবাস, আসবাব-পত্র নাই বলিলেই চলে, ঘরের চূণ-বালি খসিয়াছে, সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি অনাবশ্যক অপরিচ্ছন্নতা এতটুকু কোথাও নাই। স্বল্প বিছানা ঝর্ ঝর্ করিতেছে, দুই-চারি খানি দেব-দেবীর

ছবি টাঙানো আছে, আর আছে মেজবৌয়ের হাতের নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম। অধিকাংশই পশম ও সূতার কাজ, তাহা শিক্ষা-নবীশের হাতের লাল ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের টিয়াপাখী অথবা পাঁচরঙা বেরালের মূর্ত্তি নয়। মূল্যবান ফ্রেমে আঁটা লাল-নীল-বেগুনি-ধূসর-পাঁশুটে নানা বিচিত্র রঙের সমাবেশে পশমে বোনা 'ওয়েল-কম্' 'আসুন বসুন' অথবা বানান-ভুল গীতার শ্লোকার্দ্ধও নয়। লক্ষ্মী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটি কার ছবি মেজবৌ, যেন চেনা চেনা ঠেক্‌ছে।

মেজবৌ সলজ্জে হাসিয়া কহিল, ওটি তিলক মহারাজের ছবি দেখে বোনবার চেষ্টা করেছিলাম দিদি, কিন্তু কিছুই হয় নি। এই কথা বলিয়া সে সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো ভারতের কৌস্তুভ, মহাবীর তিলকের ছবি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

লক্ষ্মী বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চিন্‌তে পারি নি, সে আমারই দোষ মেজবৌ, তোমার নয়। আমাকে শেখাবে ভাই? ও বিদ্যে শিখতে যদি পারি ত তোমাকে গুরু ব'লে মানতে আমার আপত্তি নেই।

মেজবৌ হাসিতে লাগিল। সেদিন ঘণ্টা তিন-চার পরে বিকালে যখন লক্ষ্মী বাড়ি ফিরিয়া গেল, তখন এই কথাই স্থির করিয়া গেল যে, কলা-শিল্প শিখিতে কাল হইতে সে প্রত্যহ আসিবে।

আসিতেও লাগিল, কিন্তু দশ-পনেরো দিনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ বিদ্যা শুধু কঠিন নয়, অর্জ্জন করিতেও সুদীর্ঘ সময় লাগিবে। এক দিন লক্ষ্মী কহিল, কই মেজবৌ, তুমি আমাকে যত্ন ক'রে শেখাও না।

মেজবৌ বলিল, ঢের সময় লাগবে দিদি, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি অন্য বোনা শিখুন।

লক্ষ্মী মনে মনে রাগ করিল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিখতে কত দিন লেগেছিল, মেজবৌ?

মেজবৌ জবাব দিল, আমাকে কেউ ত শেখায় নি দিদি, নিজের চেষ্টাতেই একটু একটু ক'রে—

লক্ষ্মী বলিল, তাইতেই। নইলে পরের কাছে শিখতে গেলে তোমারও সময়ের হিসাব থাক্‌তো।

মুখে সে যাহাই বলুক, মনে মনে নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিল, মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এই মেজবৌয়ের কাছে

সে দাঁড়াইতেই পারে না। আজ তাহার শিক্ষার কাজ অগ্রসর হইল না এবং যথাসময়ের অনেক পূর্ব্বেই স্চ-স্তা-প্যাটার্ণ গুটাইয়া লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। পরদিন আসিল না এবং এই প্রথম প্রত্যহ আসায় তাহার ব্যাঘাত হইল।

দিন-চারেক পরে আবার এক দিন হরিলক্ষ্মী তাহার স্চ-স্তার বাক্স হাতে করিয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেজবৌ তাহার ছেলেকে রামায়ণ হইতে ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া গল্প বলিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, দু-তিন দিন আসেন নি, আপনার শরীর ভাল ছিল না বুঝি?

লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া কহিল, না, এম্‌নি পাঁচ-ছ দিন আসতে পারি নি।

মেজবৌ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, পাঁচ-ছ দিন আসেন নি? তাই হবে বোধ হয়; কিন্তু আজ তা হ'লে দুঘণ্টা বেশি থেকে কামাইটা পুষিয়ে নেওয়া চাই।

লক্ষ্মী বলিল, হুঁ। কিন্তু অসুখই যদি আমার ক'রে থাকতো মেজবৌ, তোমার ত এক বার খোঁজ করা উচিত ছিল?

মেজবৌ সলজ্জে বলিল, উচিত নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সংসারের অসংখ্য রকমের কাজ—একলা মানুষ, কাকেই বা পাঠাই বলুন? কিন্তু অপরাধ হয়েছে, তা স্বীকার করচি দিদি।

লক্ষ্মী মনে মনে খুসি হইল। এ কয়দিন সে অত্যন্ত অভিমানবশেই আসিতে পারে নাই, অথচ অহর্নিশি যাই যাই করিয়াই তাহার দিন কাটিয়াছে। এই মেজবৌ ছাড়া শুধু গৃহে কেন, সমস্ত গ্রামের মধ্যেও আর কেহ নাই, যাহার সহিত সে মন খুলিয়া মিশিতে পারে। ছেলে নিজের মনে ছবি দেখিতেছিল। হরিলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া কহিল, নিখিল, কাছে এস ত বাবা? সে কাছে আসিলে লক্ষ্মী বাক্স খুলিয়া একগাছি সরু সোনার হার তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, যাও, খেলা কর গে।

মায়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ওটা দিলেন না কি?

লক্ষ্মী স্মিতমুখে জবাব দিল, দিলাম বই কি?

মেজবৌ কহিল, আপনি দিলেই বা ও নেবে কেন?

লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, জ্যাঠাইমা কি একটা হার দিতে পারে না?

মেজবৌ বলিল, তা জানি নে দিদি, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই জানি, মা হয়ে আমি নিতে পারি নে। নিখিল, ওটা খুলে তোমার জ্যাঠাইমাকে দিয়ে দাও। দিদি, আমরা গরীব, কিন্তু ভিখিরি নই। কোন একটা দামী জিনিষ পাওয়া গেল বলেই তুহাত পেতে নেব, তা নিই নে।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজও তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দ্বিধা হও!

যাবার সময়ে সে কহিল, কিন্তু এ কথা তোমার ভাশুরের কানে যাবে, মেজবৌ।

মেজবৌ বলিল, তাঁর অনেক কথা আমার কানে আসে, আমার একটা কথা তাঁর কানে গেলে কান অপবিত্র হবে না।

লক্ষ্মী কহিল, বেশ, পরীক্ষা ক'রে দেখলেই হবে। একটু থামিয়া বলিল, আমাকে খামোকা অপমান করার দরকার ছিল না মেজবৌ। আমিও শাস্তি দিতে জানি।

মেজবৌ বলিল, এ আপনার রাগের কথা! নইলে আমি যে আপনাকে অপমান করি নি, শুধু আমার স্বামীকেই খামোকা অপমান করতে আপনাকে দিই নি—এ বোঝবার শিক্ষা আপনার আছে।

লক্ষ্মী কহিল, তা আছে, নেই শুধু তোমাদের পাড়া-গেঁয়ে মেয়ের সঙ্গে কোঁদল করবার শিক্ষা।

মেজবৌ এই কটূক্তির জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী চলিতে উদ্যত হইয়া বলিল, ওই হারটুকুর দাম যাই হোক, ছেলেটাকে স্নেহবশেই দিয়েছিলাম, তোমার স্বামীর দুঃখ দূর হবে ভেবে দিই নি। মেজবৌ, বড়লোক মাত্রেই গরীবকে শুধু অপমান ক'রে বেড়ায়, এইটুকুই কেবল শিখে রেখেচ, ভালবাসতেও যে পারে, এ তুমি শেখো নি! শেখা দরকার। তখন কিন্তু গিয়ে হাতে পায়ে পোড়ো না।

প্রত্যুত্তরে মেজবৌ শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না।

৩

বন্যার চাপে মাটির বাঁধ যখন ভাঙ্গিতে সুরু করে, তখন তাহার অকিঞ্চিৎকর আরম্ভ দেখিয়া মনে করাও যায় না যে, অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ এত অল্পকালমধ্যেই ভাঙনটাকে এমন ভয়াবহ, এমন সুবিশাল করিয়া তুলিবে। ঠিক এমনই হইল হরিলক্ষ্মীর। স্বামীর কাছে বিপিন ও তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাগুলা যখন তাহার সমাপ্ত হইল, তখন তাহার পরিণাম কল্পনা করিয়া সে নিজেই ভয় পাইল। মিথ্যা বলা তাহার স্বভাবও নহে, বলিতেও তাহার শিক্ষা ও মর্য্যাদায় বাধে, কিন্তু দুর্নিবার জলস্রোতের মত যে সকল কাব্য আপন ঝোঁকেই তাহার মুখ দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার অনেকগুলিই যে সত্য নহে, তাহা নিজেই সে চিনিতে পারিল। অথচ তাহার গতিরোধ করাও যে তাহার সাধ্যের বাহিরে, ইহাও অনুভব করিতে লক্ষ্মীর বাকি রহিল না। শুধু একটা ব্যাপার সে ঠিক এতখানি জানিত না, সে তাহার স্বামীর স্বভাব। তাহা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং তেমনই বর্ব্বর। পীড়ন

করিবার কোথায় যে সীমা, সে যেন তাহা জানেই না। আজ শিবচরণ আস্ফালন করিল না, সমস্তটা শুনিয়া শুধু কহিল, আচ্ছা, মাস-ছয়েক পরে দেখো। বছর ঘুরবে না, সে ঠিক।

অপমান লাঞ্ছনার জ্বালা হরিলক্ষ্মীর অন্তরে জ্বলিতেই ছিল। বিপিনের স্ত্রী ভালরূপ শাস্তি ভোগ করে, তাহা সে যথার্থই চাহিতেছিল, কিন্তু শিবচরণ বাহিরে চলিয়া গেলে তাহার মুখের এই সামান্য কয়েকটা কথা বার বার মনের মধ্যে আবৃত্তি করিয়া লক্ষ্মী মনের মধ্যে আর স্বস্তি পাইল না। কোথায় যেন কি একটা ভারি খারাপ হইল, এমনই তাহার বোধ হইতে লাগিল।

দিন-কয়েক পরে কি একটা কথার প্রসঙ্গে হরিলক্ষ্মী হাসিমুখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁদের সম্বন্ধে কিছু করছ না কি?

কাদের সম্বন্ধে?

বিপিন ঠাকুরপোদের সম্বন্ধে?

শিবচরণ নিস্পৃহভাবে কহিল, কি-ই বা করব, আর কি-ই বা করতে পারি? আমি সামান্য ব্যক্তি বৈ ত না!

হরিলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, এ কথার মানে?

শিবচরণ বলিল, মেজবৌমা ব'লে থাকেন কি না, রাজত্বটা ত আর বট্‌ঠাকুরের নয়—ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের!

হরিলক্ষ্মী কহিল, বলেছে না কি? কিন্তু, আচ্ছা—

কি আচ্ছা?

স্ত্রী একটুখানি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, কিন্তু মেজবৌ ত ঠিক ও রকম কথা বড় একটা বলে না। ভয়ানক চালাক কি না! অনেকে আবার বাড়িয়েও হয় ত তোমার কাছে ব'লে যায়।

শিবচরণ কহিল, আশ্চর্য্য নয়, তবে কি না, কথাটা আমি নিজের কানেই শুনেছি।

হরিলক্ষ্মী বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু তখনকার মত স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সহসা কোপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, বল কি গো, এত বড় অহঙ্কার! আমাকে না হয় যা খুসি বলেছে, কিন্তু ভাশুর ব'লে তোমার ত একটা সম্মান থাকা দরকার!

শিবচরণ বলিল, হিঁদুর ঘরে এই ত পাঁচ জনে মনে করে। লেখাপড়া-জানা বিদ্বান মেয়েমানুষ কি না! তবে আমাকে অপমান ক'রে পার আছে, কিন্তু তোমাকে অপমান ক'রে কারও রক্ষে নেই। সদরে একটু জরুরি

কাজ আছে, আমি চল্‌লাম। বলিয়া শিবচরণ বাহির হইয়া গেল। কথাটা যে রকম করিয়া হরিলক্ষ্মীর পাড়িবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না, বরঞ্চ উল্টা হইয়া গেল। স্বামী চলিয়া গেলে ইহাই তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল।

সদরে গিয়া শিবচরণ বিপিনকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, পাঁচ-সাত বছর থেকে তোমাকে ব'লে আসচি, বিপিন, গোয়ালটা তোমার সরাও, শোবার ঘরে আমি আর টিক্‌তে পারি নে, কথাটায় কি তুমি কান দেবে না ঠিক করেছ ?

বিপিন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ আমি ত একবারও শুনি নি বড়দা ?

শিবচরণ অবলীলাক্রমে কহিল, অন্ততঃ দশবার আমি নিজের মুখেই তোমাকে বলেছি। তোমার স্মরণ না থাক্‌লে ক্ষতি হয় না, কিন্তু এত বড় জমিদারী যাকে শাসন কর্‌তে হয় তার কথা ভুলে গেলে চলে না। সে যাই হোক্, তোমার আপনার ত একটা আক্কেল থাকা উচিত যে, পরের জায়গায় নিজের গোয়ালঘর রাখা কতদিন চলে ? কালকেই ওটা সরিয়ে ফেল গে। আমার আর

সুবিধে হবে না, তোমাকে শেষবারের মত জানিয়ে দিলাম।

বিপিনের মুখে এমনিই কথা বাহির হয় না, অকস্মাৎ এই পরম বিস্ময়কর প্রস্তাবের সম্মুখে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পিতামহর আমল হইতে যে গোয়ালঘরটাকে সে নিজেদের বলিয়া জানে, তাহা অপরের, এত বড় মিথ্যা উক্তির সে একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করিতে পারিল না, নীরবে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

তাহার স্ত্রী সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, কিন্তু রাজার আদালত খোলা আছে ত?

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। সে যত ভাল মানুষই হোক, এ কথা সে জানিত, ইংরাজ রাজার আদালতগৃহের সুবৃহৎ দ্বার যত উন্মুক্তই থাক্, দরিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ এতটুকু খোলা নাই; হইলও তাহাই। পরদিন বড়বাবুর লোক আসিয়া প্রাচীন ও জীর্ণ গো-শালা ভাঙ্গিয়া লম্বা প্রাচীর টানিয়া দিল। বিপিন থানায় গিয়া খবর দিয়া আসিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শিবচরণের পুরাতন ইটের নূতন প্রাচীর যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটা রাঙা পাগড়ীও ইহার নিকটে

আসিল না। বিপিনের স্ত্রী হাতের চুড়ি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল, কিন্তু তাহাতে শুধু গহনাটাই গেল, আর কিছু হইল না।

বিপিনের পিসিমা সম্পর্কীয়া এক জন শুভানুধ্যায়িনী এই বিপদে হরিলক্ষ্মীর কাছে গিয়া পড়িতে বিপিনের স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে সে নাকি জবাব দিয়াছিল, বাঘের কাছে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি পিসিমা? প্রাণ যা যাবার তা যাবে, কেবল অপমানটাই উপরি পাওনা হবে।

এই কথা হরিলক্ষ্মীর কানে আসিয়া পৌঁছিলে, সে চুপ করিয়া রহিল, একটা উত্তর দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া অবধি শরীর তাহার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না, এই ঘটনার মাস-খানেকের মধ্যে সে আবার জ্বরে পড়িল। কিছুকাল গ্রামের চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ফল যখন হইল না, তখন ডাক্তারের উপদেশমত পুনরায় তাহাকে বিদেশ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

নানাবিধ কাজের তাড়ায় এবার শিবচরণ সঙ্গে যাইতে

পারিল না, দেশেই রহিল। যাবার সময় সে স্বামীকে একটা কথা বলিবার জন্য মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনমতেই সে এই লোকটির সম্মুখে সে কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ অনুরোধ বৃথা, ইহার অর্থ সে বুঝিবে না।

হরিলক্ষ্মীর রোগগ্রস্ত দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে এবার কিছু দীর্ঘ সময় লাগিল। প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে সে বেলপুরে ফিরিয়া আসিল। শুধু কেবল জমিদারের আদরের পত্নী বলিয়াই নয়, সে এত বড় সংসারের গৃহিণী, পাড়ার মেয়েরা দল বাঁধিয়া দেখিতে আসিল। যে সম্বন্ধে বড়, সে আশীর্ব্বাদ করিল, যে ছোট সে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। আসিল না শুধু বিপিনের স্ত্রী। সে যে আসিবে না, হরিলক্ষ্মী তাহা জানিত। এই একটা বছরের মধ্যে তাহারা কেমন আছে, যে সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা তাহাদের বিরুদ্ধে চলিতেছিল, তাহার ফল কি হইয়াছে, এ সব কোন সংবাদই সে কাহারও কাছে জানিবার চেষ্টা করে নাই। শিবচরণ কখনও বাটীতে কখনও বা পশ্চিমে স্ত্রীর কাছে গিয়া বাস করিতেছিল। যখনই দেখা হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ইহাদের কথাই তাহার মনে হইয়াছে, অথচ একটা দিনের জন্য স্বামীকে প্রশ্ন করে নাই। প্রশ্ন করিতে তাহার যেন ভয় করিত। মনে করিত, এত দিনে হয় ত যা হোক একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে, হয় ত ক্রোধের সে প্রখরতা

আর নাই—জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে আবার সেই পূর্ব্বক্ষত বাড়িয়া উঠে, এ আশঙ্কায় সে এমনই একটা ভাব ধারণ করিয়া থাকিত, যেন সে সকল তুচ্ছ কথা আর তাহার মনেই নাই। ও দিকে শিবচরণও নিজে হইতে কোন দিন বিপিনদের বিষয় আলোচনা করিত না। সে যে স্ত্রীর অপমানের ব্যাপার বিস্মৃত হয় নাই, বরঞ্চ তাহার অবর্ত্তমানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, এই কথাটা সে হরিলক্ষ্মীর কাছে গোপন করিয়াই রাখিত। তাহার সাধ ছিল, লক্ষ্মী গৃহে ফিরিয়া নিজের চোখেই সমস্ত দেখিতে পাইয়া আনন্দিত, বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া উঠিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পিসিমার পুনঃ পুনঃ সস্নেহ তাড়নায় লক্ষ্মী স্নান করিয়া আসিলে তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার রোগা শরীর বৌমা, নিচে গিয়ে কাজ নেই, এইখানেই ঠাঁই ক'রে ভাত দিয়ে যাক্।

লক্ষ্মী আপত্তি করিয়া সহাস্যে কহিল, শরীর আগের মতই ভাল হয়ে গেছে পিসিমা, আমি রান্নাঘরে গিয়েই খেতে পারবো, ওপরে বয়ে আন্‌বার দরকার নেই। চল, নিচেই যাচ্চি।

পিসিমা বাধা দিলেন, শিবুর নিষেধ আছে জানাইলেন এবং তাঁহারই আদেশে ঝি ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণে রাঁধুনী অন্নব্যঞ্জন বহিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। সে চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাঁধুনীটি কে, পিসিমা? আগে ত দেখি নি?

পিসিমা হাস্য করিয়া বলিলেন, চিন্‌তে পার্‌লে না বৌমা, ও যে আমাদের বিপিনের বৌ।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে বুঝিল, তাহাকে চমৎকৃত করিবার জন্যই এতখানি ষড়যন্ত্র এমন করিয়া গোপনে রাখা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসু মুখে পিসিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিসিমা বলিলেন, বিপিন মারা গেছে, শুনেছ ত?

লক্ষ্মী শুনে নাই কিছুই, কিন্তু এইমাত্র যে তাহার খাবার দিয়া গেল, সে যে বিধবা, তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

পিসিমা অবশিষ্ট ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিলেন, যা ধূলোগুঁড়ো ছিল, মামলায় মামলায় সর্ব্বস্ব খুইয়ে বিপিন

মারা গেল। বাকি টাকার দায়ে বাড়িটাও যেতো, আমরা পরামর্শ দিলাম, মেজবৌ, বছর দুবছর গতরে খেটে শোধ দে, তোর অপগণ্ড ছেলের মাথা গোঁজবার স্থানটুকু বাঁচুক।

লক্ষ্মী বিবর্ণ মুখে তেমনই পলকহীন চক্ষুতে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। পিসিমা সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, তবু আমি একদিন ওকে আড়ালে ডেকে বলেছিলাম, মেজবৌ, যা হবার তা ত হ'লো, এখন ধার-ধোর ক'রে যেমন ক'রে হোক, একবার কাশী গিয়ে বৌমার হাতে পায়ে গিয়ে পড়। ছেলেটাকে তার পায়ের ওপর নিয়ে ফেলে দিয়ে বল গে, দিদি, এর ত কোন দোষ নেই, একে বাঁচাও—

কথাগুলি আবৃত্তি করিতেই পিসিমার চোখ জল-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু সেই যে মাথা গুঁজে মুখ বুজে ব'সে রইল, হাঁ-না একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না।

হরিলক্ষ্মী বুঝিল, ইহার সমস্ত অপরাধের ভারই তাহার মাথায় গিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন তিক্ত বিষ হইয়া উঠিল, এবং একটা গ্রাসও যেন গলা দিয়া গলিতে চাহিল না। পিসিমা কি একটা কাজে ক্ষণকালের

জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া খাবারের অবস্থা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ডাক দিলেন, বিপিনের বৌ! বিপিনের বৌ!

বিপিনের বৌ দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তাঁর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের করুণা, চক্ষুর নিমেষে কোথায় উবিয়া গেল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, এমন তাচ্ছিল্য ক'রে কাজ কর্‌লে ত চল্‌বে না, বিপিনের বৌ! বৌমা একটা দানা মুখে দিতে পারলে না, এমনই রেঁধেছ!

ঘরের বাহির হইতে এই তিরস্কারের কোন উত্তর আসিল না, কিন্তু অপরের অপমানের ভারে লজ্জায় ও বেদনায় ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। পিসিমা পুনশ্চ কহিলেন, চাকরি করতে এসে জিনিষ-পত্র নষ্ট ক'রে ফেললে চলবে না, বাছা, আরও পাঁচজনে যেমন ক'রে কাজ করে, তোমাকে তেমনই কর্‌তে হবে, তা ব'লে দিচ্চি।

বিপিনের স্ত্রী এবার আস্তে আস্তে বলিল, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করি পিসিমা, আজ হয় ত কি রকম হয়ে গেছে। এই বলিয়া সে নিচে চলিয়া গেলে, লক্ষ্মী উঠিয়া

দাঁড়াইবামাত্র পিসিমা হায় হায় করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী মৃদু কণ্ঠে কহিল, কেন দুঃখ করচ পিসিমা, আমার দেহ ভাল নেই বলেই খেতে পার্‌লাম না—মেজবৌয়ের রান্নার ত্রুটি ছিল না।

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া নিজের নির্জ্জন ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্ব-প্রকার অপমান সহিয়াও বিপিনের স্ত্রীর হয় ত ইহার পরেও এই বাড়িতেই চাক্‌রি করা চলিতে পারে, কিন্তু আজকের পরে গৃহিণীপনার পণ্ডশ্রম করিয়া তাহার নিজের দিন চলিবে কি করিয়া? মেজবৌয়ের একটা সান্ত্বনা তবুও বাকি আছে—তাহা বিনা দোষে দুঃখ সহার সান্ত্বনা, কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোথায় কি অবশিষ্ট রহিল!

রাত্রিতে স্বামীর সহিত কথা কহিবে কি, হরিলক্ষ্মী ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারিল না। আজ তাহার মুখের একটা কথায় বিপিনের স্ত্রীর সকল দুঃখ দূর হইতে পারিত, কিন্তু নিরুপায় নারীর প্রতি যে মানুষ এত বড় শোধ লইতে পারে, তাহার পৌরুষে বাধে না, তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিবার হীনতা স্বীকার করিতে কোনমতেই লক্ষ্মীর প্রবৃত্তি হইল না।

শিবচরণ ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, মেজবৌমার সঙ্গে হ'ল দেখা? বলি কেমন রাঁধচে?

হরিলক্ষ্মী জবাব দিতে পারিল না, তাহার মনে হইল, এই লোকটিই তাহার স্বামী এবং সারাজীবন ইহারই ঘর করিতে হইবে মনে করিয়া তাহার মনে হইল, পৃথিবী দ্বিধা হও!

পরদিন সকালে উঠিয়াই লক্ষ্মী দাসীকে দিয়া পিসিমাকে বলিয়া পাঠাইল, তাহার জ্বর হইয়াছে, সে কিছুই খাইবে না। পিসিমা ঘরে আসিয়া জেরা করিয়া লক্ষ্মীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন—তাহার মুখের ভাবে ও কণ্ঠস্বরে তাঁহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, লক্ষ্মী কি একটা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কহিলেন, কিন্তু তোমার ত সত্যিই অসুখ করে নি বৌমা?

লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া জোর করিয়া বলিল, আমার জ্বর হয়েছে, আমি কিচ্ছু খাব না।

ডাক্তার আসিলে তাহাকে দ্বারের বাহির হইতে লক্ষ্মী বিদায় করিয়া দিয়া বলিল, আপনি ত জানেন, আপনার ওষুধে আমার কিছুই হয় না—আপনি যান।

শিবচরণ আসিয়া অনেক কিছু প্রশ্ন করিল, কিন্তু একটা কথারও উত্তর পাইল না।

আরও দুই-তিন দিন যখন এমনই করিয়া কাটিয়া গেল, তখন বাড়ির সকলেই কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সেদিন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর, লক্ষ্মী স্নানের ঘর হইতে নিঃশব্দে মৃদু পদে প্রাঙ্গণের এক ধার দিয়া উপরে যাইতেছিল, পিসিমা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ বৌমা, বিপিনের বৌয়ের কাজ ; অ্যাঁ মেজবৌ, শেষকালে চুরি সুরু করলে ?

হরিলক্ষ্মী কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মেজবৌ মেঝের উপর নির্ব্বাক অধোমুখে বসিয়া, একটা পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন গামছা ঢাকা দেওয়া সম্মুখে রাখা। পিসিমা দেখাইয়া বলিলেন, তুমিই বল বৌমা, এত ভাত তরকারী একটা মানষে খেতে পারে ? ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্চে ছেলের জন্যে ; অথচ বার বার ক'রে মানা ক'রে দেওয়া হয়েছে। শিবচরণের কানে গেলে আর রক্ষা থাক্‌বে না—ঘাড় ধ'রে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। বৌমা, তুমি মনিব, তুমিই এর বিচার কর। এই বলিয়া পিসিমা যেন একটা কর্ত্তব্য শেষ করিয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিলেন।

তাঁহার চিৎকার শব্দে বাড়ির চাকর, দাসী, লোকজন

যে যেখানে ছিল, তামাসা দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, আর তাহারই মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়া ও-বাড়ির মেজবৌ ও তাহার কর্ত্রী এ-বাড়ির গৃহিণী।

এত ছোট, এত তুচ্ছ বস্তু লইয়া এত কদর্য্য কাণ্ড বাধিতে পারে, লক্ষ্মীর তাহা স্বপ্নের অগোচর। অভি-যোগের বিচার করিবে কি, অপমানে, অভিমানে, লজ্জায় সে মুখ তুলিতেই পারিল না। লজ্জা অপরের জন্য নয়, সে নিজের জন্যই। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে লাগিল, তাহার মনে হইল, এত লোকের সম্মুখে সে-ই যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং বিপিনের স্ত্রী-ই তাহার বিচার করিতে বসিয়াছে।

মিনিট দুই-তিন এমনই ভাবে থাকিয়া সহসা প্রবল চেষ্টায় লক্ষ্মী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, পিসিমা, তোমরা সবাই একবার এ ঘর থেকে যাও।

তাহার ইঙ্গিতে সকলে প্রস্থান করিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে মেজবৌয়ের কাছে গিয়া বসিল; হাত দিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তাহারও দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে। কহিল, মেজবৌ, আমি তোমার দিদি, এই বলিয়া নিজের অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল।

মহেশ

১

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই; অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্দ্ধ গতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। তাহার প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে

মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্রা, বলি, ঘরে আছিস্?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর।

জ্বর! ডেকে দে হতভাগাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাব্‌লা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খর-বাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফের্‌বার পথে দেখ্‌চি তেমনি ঠায় বাঁধা।

গোহত্যা হলে যে কর্ত্তা তোকে জ্যান্তে কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।

কি কর্‌ব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। কদিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দুখুঁটো খাইয়ে আন্‌ব—তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনিই চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয় নি—খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয় নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ ত ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দুআঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি। ফ্যানে জলে দে না এক গামলা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়?

ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখ্‌তে নেই? বেটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্ত্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে পড়ে বল্‌লাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্‌। সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচি নে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস-দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে

না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাঁহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল; কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই—খেয়ে রেখেছিস্, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস্—অধম কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস্।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবা-ঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে; কিন্তু কোথা থেকে দিই, বল ত? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপ্‌রি উপ্‌রি দু সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজ্‌রা গোণা যাচ্চে—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহণ-দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেটপুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দুপা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্, ছুঁয়ে ফেল্‌বি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না ; কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—এ কটি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব—কথা বল্‌তে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি, শুধ্‌বি কি করে শুনি ?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধ্‌বো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না। যেমন করে পারি শুধ্‌বো ! বেশ রসিক যা হ'ক ! যা যা সর্, পথ ছাড়্। ঘরে যাই, বেলা হ'য়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি !

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে, এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেম্‌নি বলদ। খড় জোটে না, চাল কলা খাওয়া চাই! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ্‌। যে শিঙ, কোন্ দিন দেখচি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না! না দিক্ গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস্, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর

রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেম্‌নি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল, তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখি বল্‌? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শীগ্‌গির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা?

কেন মা?

ভাত খাবে এসো, বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া

কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েচ বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোনো পচা খড় মা আপনিই ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুন্‌তে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কর্‌চ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে!

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে

এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না, এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড় ক্ষিদে পেয়েচে?

তখন? তখন হয় ত জ্বর ছিল না মা।

তা হ'লে তুলে রেখে দি, সাঁঝের-বেলা খেয়ো?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা?

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের-বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পার্‌বি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার

মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পার্‌ব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

২

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ, কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মাণিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি!

হাঁ বাবা, সত্যি! তাদের চাকর বল্‌লে, তোর বাপকে বল গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু ও আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার হয় নাই। বিশেষতঃ মাণিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আন্‌তে যাবে না ?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বল্‌লে তিন দিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌বে ?

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখ মাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত, ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে ; কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নিচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়ের মধ্যে সে বার পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই

বাবলাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি! একজন বুড়া-গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙাব না, এই পুরোপুরিই দিলাম—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বল্‌চি—খবরদার বল্‌চি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়ো আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেম্‌নি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি? আমার জিনিষ আমি বেচ্‌ব না—আমার খুসি। বলিয়া সে নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আস্‌তে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে! বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দুটাকা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চামড়াটাই যা দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চিৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছু-ক্ষণেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্ত্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল, শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব, ভেবে পাই নে। কোথায় বাস করে আছিস্, জানিস্?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না কর্‌তাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদ্-মেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো করব না কর্ত্তা! বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিববাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস্ নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং

এ মহাপাতক যে শুধু কর্ত্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসন ভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যে জন্য এই ধর্ম্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ, তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে, মাথায় ও শিঙে বারম্বার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

৩

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্ত্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ এ কথা ভাবিতে যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহঃ ঝরিতেছে, ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এম্‌নি দিনে দ্বিপ্রহর-বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে; কিন্তু দেহ যেমন দুর্ব্বল, তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয়

নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েছে রে ?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত ? কি বল্‌লি—হয় নি ? কেন শুনি ?

চাল নেই বাবা !

চাল নেই ? সকালে আমাকে বলিস্‌ নি কেন ?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম ?

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম ! রাত্তিরে বল্‌লে কারু মনে থাকে ? নিজের কর্কশ কণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাক্‌বে কি করে ? রোগা বাপ খাক্‌ আর না খাক্‌ বুড়ো মেয়ে চার বার পাঁচ বার করে ভাত গিলবি ! এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল, তাও নেই ?

আমিনা তেম্‌নি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস্‌ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগী মেয়ে, সারাদিন তুই করিস্‌ কি? এত লোকে মরে, তুই মরিস্‌ নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল, তাহার এই স্নেহশীলা কর্ম্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্য্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোন দিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব, তেম্‌নি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী

আছে, তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি, তেম্‌নি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয় ত আজ জল ছিল না, কিম্বা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এম্‌নিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চিৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস্‌?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাক্‌চেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া-দাওয়া হয় নি, পরে যাবো।

এতবড় স্পর্দ্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কড়া মেজাজে কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণকণ্ঠ অতবড় কানে গিয়া পৌঁছায় না—না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পর কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল, তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে

ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়—ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছে। পূর্ব্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয় ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্দ্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁস ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্ত্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তার বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া

গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবারমাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বহিয়া ফোঁটাকয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি

দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই—সেখানে ধর্ম্ম থাকে না, ইজ্জত আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস্ নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার

পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।

অভাগীর স্বর্গ

১

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধূম-ধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দূর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া, আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ

মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুক্‌রা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধূনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপন করা হইল, তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি

দেখিয়া তাহার দু চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আল্‌তা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল, তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো—আমাকেও আশীর্ব্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুন-টুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন। সে ত সোজা কথা নয়। স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছেন—মুখ তাঁহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিন্দুরের রেখা, পদতল দুটি আল্‌তায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে

চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধ্‌বি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, ছ্যাখ ছ্যাখ বাবা—বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে।

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্ মা। ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে, তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদ্‌ব কিসের জন্যে রে—চোখে ধোঁ লেগেছে বইত নয়!

হাঁঃ, ধোঁ লেগেছে বই ত না! তুই কাঁদ্‌তেছিলি।

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

২

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতা-পুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজেদের নামগুলাকেই যেন আমরণ ভ্যাঙ্‌চাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট কাঙাল-জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহার জন্মের পরই তাহার মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল, তাহার নাম রসিক বাঘ। কিছু দিনের মধ্যেই সে অভাগীকে ফেলিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ওই শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনেরয় পা

দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না ক্ষিদে নেই বই কি। কই দেখি তোর হাঁড়ি।

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায়

নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। একহাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বল্‌তে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মাঠাকুরুণ রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে বসে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখ্‌লে রে!

সবাই দেখ্‌লে?

সব্বাই দেখ্‌লে!

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে। সেই

মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তাহলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বল্‌তেছিল, ক্যাঙ্‌লার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে পাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ্‌ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন কত দুঃখু-কষ্টের মধ্যেই না তোকে প'ড়তে হ'লো। তবু একদিনের জন্যেও বাবার ওপর তোর রাগ দেখি নে। তোর আশা, কাঙালী বাঁচলে তোর দুঃখু ঘুচ্‌বে। হাঁ মা, তুই না থাক্‌লে আমি কোথায় থাক্‌তুম? আমি হয় ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ নানা রকম পরামর্শ দিবার লোকের অভাব না হইলেও সাহায্য করিবার মত লোক সেদিন পাওয়া যায় নাই। এমন কি উৎপাত, উপদ্রবও যথেষ্টই তাহাদিগকে সহিতে হইয়াছে। সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া

জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কাঁথাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক্ গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল তা হলে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—

নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশান-যাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত, হরি! তার আকাশ-জোড়া ধুঁয়ো ত

ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্ নে মা, বলিস্ নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আন্‌বি, অম্‌নি যেন পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অম্‌নি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদূর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৩

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্মৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্য ভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদা-কাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তাহার কত কি আয়োজন ; খল, মধু, আদার সত্ব, তুলসী পাতার রস। কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি, বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না!

দিন দুই-তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্ ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া

চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হয় না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনিই ভাল হব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উন্নুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস্‌ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আস্‌বে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধূলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাঁটা করিস্‌ বাবা, বলিস্‌ মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফের্‌বার পথে অম্‌নি নাপ্‌তে

বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস্ ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এত রকম করিয়া শুনিয়াছে যে সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

৪

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধূলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে, তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দীর পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধূলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন বসন দেয় নাই, কোন

খোঁজ-খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন? এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা—ক্যাঙলার হাতে আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিম্বা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার

গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল ; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, বেটা একি তোর নিজের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী! বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তখন তাহাকেও একটা গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে, কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত মুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন ; গ্রামে তাঁহার একটা

কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা। লোকগুলা যখন দরওয়ানটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল। অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিতে ছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হতভাগা খাজনা দেয় নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাট্‌তেছিল —আমার মা মরেচে—, বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকাল-বেলা এই কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত

হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত নিচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবর-জল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে? দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে? তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যা সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্‌গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের

কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার !

কাঙালী বলিল, সে আমাদের উঠানের গাছ বাবু-মশায় ? সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ !

হাতে পোঁতা গাছ ! পাঁড়ে, বেটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত !

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল, যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকুরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ বেটার খাজনা বাকি পড়েছে কিনা।

থাকে ত জালটাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হতভাগা পালাতে পারে।

মুখুয্যে বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতে ছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছেন তেনাকে আগুন দিতে।

তা দিগে না।

কাছারীর ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আব্দার! আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ! যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—না, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড়ছেলে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্‌ছেন ভট্‌চাযমশায়, সব বেটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সমাপ্ত
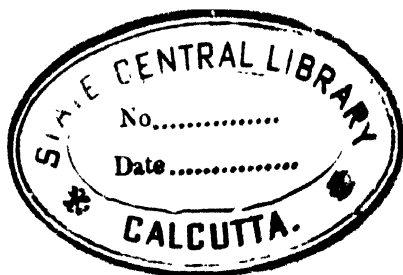
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬